রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যাপক

ভাদ্র, ১৩০৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভুল হউক আর ঠিক হউক, সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকেই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম ; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কলেজে এইরূপে শেষপর্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক নূতন অধ্যাপকের মূর্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন সুবিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উজ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে ; অল্পদিন হইল এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত, আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে-সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশজন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট একজনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হইবে--চমৎকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে-অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজিভাষার বিশুদ্ধ তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারো কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণবাবু উঠিয়া শান্তগম্ভীর স্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে-অংশ চুরি সে-অংশ অতি চমৎকার, এবং যে-অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমন কি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ে লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কী বলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম। আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য ! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সেকথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহার চেয়েও বেশি মনে করিত। অতএব, আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না ; কারণ, সেন টিকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র ছিল না এইরূপ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল, ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে-সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই ; বামাচরণবাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাবসকল নির্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃজিত হইয়া উঠে নাই। বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল থাকে, বামাচরণবাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি অনেকস্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদুত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে ! সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমনকি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমনকি, সেক্সপিয়রও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে। ভালো ভালো এইরূপ আরও অনেক কথা ছিল, কিন্তু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচসাতদিন পরে একে একে উত্তরগুলি দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল ; কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগুলি আমাকেই বিঁধিয়া মারিল। ভাবিতাম, একথাগুলো অন্তত আমার ক্লাসের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্দভদিগের বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল। তাহার জানিত, চুরিমাত্রেই চুরি ; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি-এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না ; প্রভাতে যখন যশঃসূর্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়া ছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য অস্তোন্মুখ হইল তখনো সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রদ্ধায় কোনো পরিতৃপ্তি নাই, ইহা শূন্য ছায়ামাত্র, ইহা মূঢ় ভক্তহৃদয়ের মোহান্ধকার, ইহা বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব ; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জন এবং শত্রুকে মার্জনা-- এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হউক পদ্যে হউক, খুব 'সাব্লাইম'-গোছের একটা-কিছু লিখিব ; বাঙালী সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীর্তিটির সৃষ্টিকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তত একমাসকাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অমূল্যকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে যেন তখনি আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্তী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণজ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "যাও, ভাই, অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া আইস।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ; মনে হইল, যেন আসন্নগৌরবগর্বিত ভক্তিবিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না ; সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাসকাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙার বাগানে অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নির্জন ঘরে চিত হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহ্নে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত ; কোনোমতে চিত্তবিনোদন ও সময় যাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুর গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বসিতাম, টেলিগ্রাফের কাঁটা কট্‌কট্‌ শব্দ করিত, টিকিটের ঘন্টা বাজিত, লোকসমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লৌহসরীসৃপ ফুঁষিত ফুঁষিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়াহুড়ি পড়িত, কিয়ৎক্ষণের জন্য কৌতুকবোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া, আহার করিয়া, সঙ্গী অভাবে সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় যাপন করিতাম। শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্য শ্মশানের মতো বোধ হইতে লাগিল ; অমূল্যটাও এমনি গর্দভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে-- মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি এবং চারিদিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি-- কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীমুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক ! একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বটবৃক্ষের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরস্পর শোনা গিয়াছিল যে, তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।
বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদম্বগুলি মজুমদার নামক একটি কাল্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীব্র এক প্রহসন লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমনসময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্নে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সেদিন নিতান্তই সময়যাপনের উদ্দেশে বায়ুভরে উড্ডীন চ্যুতপত্রের মতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।
উত্তরদিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাত্রসংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্তী অবকাশ দিয়া আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।
কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তখন আমার আর কিছুই দেখিবার অবসর হয় নাই, কেবল দেখিয়াছিলাম, একটি ষোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।
ঠিক সেসময়ে কোনোরূপ তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুষ্যন্ত বড়ো বড়ো বাণ শরাসন বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দশমিনিট কাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনের সকল দেখাশুনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম ; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।
পৃথিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই-- কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তরদিকের বারান্দায় আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমূর্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুনশেষের অপরাহ্নে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক-রেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে, জুতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন -- আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।
দুই মিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যায় প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে প্রসারিত চরণে বসিলাম -- আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল, এবং

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে-বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সে আমার পক্ষে একটা নূতন রহস্যনিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য ? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে । যে-পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপর সেই অপরাহ্নবেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্মর এবং সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ, কাব্যের কোন্ রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল। সেইসঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুক্ত কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহৃদয়ের নিভৃত নির্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃজন করিতেছিল-- অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু, সে যে কুমারী এ কথা আমাকে এ বলিল। আমার বহুপূর্ববর্তী প্রেমিক দুষ্যন্তকে পরিচয়লাভের পূর্বেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা ; তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন ; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দুষ্যন্তর এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সে-সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না, কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেষ্টন করিয়া করিয়া উর্ধ্বকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্ন একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিয়া নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবনকুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কন্বের কুটিরের মতো ছিল না ; গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল দেখিলাম, আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন ; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে তাঁহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি চৌকিতে ঠেস্ দিয়া উর্ধ্বমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের উপরের সিঁড়িতে এবং একটি তাঁহার নিচের সিঁড়িতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেষ্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, যেন মূর্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী ! সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দসুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুদূর পরপার এবং উর্ধ্বে তীব্রতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অত্মরাআরূপিণীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিন্যস্ত বাম বাহু, সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটি তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল, তখন হঠাৎ যেন কী একটা ত্রুটি স্মরণ হইল, চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম, "মাঝি, আজ আর আমার হুগলি যাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।" কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা

সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের মতো ভীরু। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌতূহলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল, মুহূর্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল ; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথায় তাহার বাজিল !

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্ধদষ্ট সল্পপক্ক পেয়ারা গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন সোপানে আসিয়া পড়িল, সেই দশনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, আধ ঘন্টার মধ্যে তাহার নির্লজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্লিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীণ হইলাম।

বটবৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে-- আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উতলা, তাহার মধ্যে দুইখানি অনাবৃত চরণ স্থির নিষ্পন্দ সুন্দর ; তাহারা জানেও না যে, তাহাদের রেণুকণার মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর, সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোলো !"

প্রকৃতির সেই নীরব অনুনয়ে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিতে থাকে। বারম্বার কেবল এই গান শুনি, "হে সুন্দরী, হে মনোহারিণী, হে বিশ্বজয়িনী, হে মনপ্রাণপতঙ্গের একটিমাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু !" এ-গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না ; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না ; মনে হয়, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মতো একটা অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনো তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার ললাট অলৌকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমনসময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইল, আশা করি, শত্রুর প্রতিও কাহারও যেন সেইরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিপ্তের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যর মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মৃদুমন্দগমনে আসিতে লাগিল ; দেখিয়া আমার আরও রাগ হইল, কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অমূল্য, ব্যাপারখানা কী ! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল নাকি ।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম ; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরুতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি রুমাল লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল, কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না ।" বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে-কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে-গাছের

কাষ্ঠদণ্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়সুদ্ধ উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুনে প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অমূল্য সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে কাব্যের কতদূর।" শুনিয়া আরও আমার গা জ্বলিতে লাগিল, মনে মনে কহিলাম, "যেমন আমার কাব্য তেমনি তোমার বুদ্ধি।" মুখে কহিলাম, "সেসব পরে হইবে ভাই, আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।"

অমূল্য লোকটা কৌতূহলী, চারিদিক পর্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না, তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওদিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছু না!" এতবড়ো মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া, দগ্ধ করিয়া , তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে অমূল্য চলিয়া গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সেদিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই, কৃপণ যেমন তাহার রত্নভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অমূল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্না ; নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার ; মর্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘনিশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতায় তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতেছিল-- বৃদ্ধ সস্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগ-সহকারে শুনিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না, সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে ক্বচিৎ দাঁড়ের শব্দ সুদূরে বিলীন হইতেছিল এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল ; আমি যেন বুঝিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নিচে পড়িয়া থাকে অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পারে অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ঐ পদবিক্ষেপ, ঐ বিশ্রম্ভালাপ, অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথবাবু তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোখে চশমা দিয়া নীলপেন্সিলে-দাগকরা একখানা হ্যামিল্‌টনের পুরাতন পুঁথি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন, বই হইতে মনটাকে এক মুহূর্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া ত্রস্তভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে চশমার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন "আপনি চা খাইবেন ?" আমি যদিও চা খাই না, তথাপি বলিলাম, "আপত্তি নাই।" ভবনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া 'কিরণ' 'কিরণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম, "কী বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসকন্যদুহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত হরিণীর মতো পলায়নোদ্যতা হইয়াছেন। ভবনাথবাবু তাঁহাকে ফিরিয়া

ডাকিলেন ; আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্রকুমার বাবু।" এবং আমাকে কহিলেন, "ইনি আমার কন্যা কিরণবালা।" আমি কী করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রসুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথবাবু কহিলেন, "মা, মহীন্দ্রবাবুর জন্য এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতে হইবে।" আমি মনে মনে সংকুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন ; অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দীভৃঙ্গী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথবাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্বে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি-এ পরীক্ষার জন্য জর্মানপণ্ডিত-বিরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য-ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে ভবনাথবাবুর সহিত কেবল দর্শন আলোচনার জন্যই আসিতাম এইপ্রকার ভাণ করিলাম। তিনি হ্যামিল্‌টন প্রভৃতি কতকগুলি সেকাল-প্রচলিত ভ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনো নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার নূতন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাবু এমনি ভালোমানুষ, এমনি সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুণ্ন হই। কিরণ আমাদের এইসকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে দুঃসহ ; সে যখন মনে-মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাণ করিত তখন তাহাকে কত উচ্চেই চাহিতে হইত।

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্রভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বলিয়া জানিলাম, এখন আর সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ারূপিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া, একটি নির্দিষ্ট বাঙালিঘরের মধ্যে কুমারীকন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দুই হাতে দুটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছু নয় কিন্তু বড়ো সুমিষ্ট, শাড়ির প্রান্তটি কখনো কবরীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে কখনো বা পিতৃগৃহের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তবুও সে যে আমাদের, সেজন্য আমার অন্তঃকরণ সর্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথবাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহসহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম ; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাঁধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া, ভবনাথবাবুকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাবুকে ঐসকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ! আসুন মহীন্দ্রবাবু, তার চেয়ে আমার রান্নায় যোগ দিলে কাজে লাগিবে।"

ভবনাথবাবুর কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাবু অপরাধীর

মতো অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে ! আচ্ছা ও কথাটা আর একদিন হইবে।" এই বলিয়া নিরুদ্‌বিগ্নচিত্তে তিনি তাঁহার নিত্যনিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।
আবার আর-একদিন অপরাহ্নে আর-একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমনসময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, "মহীন্দ্রবাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাথবাবুও প্রফুল্লমনে পড়িতে বসিলেন।
এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাবুর কাছে আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে-মনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম, আমি বুঝিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি ; সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভবনাথবাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।
বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দুরূহ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমনসময় কিরণ আসিয়া বিলত, "মহীন্দ্রবাবু রান্নাঘরের পাশে আমার বেগুনের খেত আপনাকে দেখাইয়া আনিগে, চলুন।"
আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোনো-একরূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমনসময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাবু, দুটা আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।"
কী উদ্ধার, কী মুক্তি ! অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মুহূর্তে কী সুন্দর কূলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দুশ্ছেদ্য জটিল হউক-না কেন, কিরণের বেগুনের খেত বা আমতলা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার দুরূহতা ও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আরাম তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে-প্রেমসমুদ্র সৃজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম, সমুদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে তুচ্ছতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল ছন্দে লয়ে সংগীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া যায় না। কিরণ সেখান হইতে মজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায় তাহার বেগুনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবুগাছে ঘনসবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবুফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না-- আপনি যে-কথা মুখে আসে, আপনি যে-হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস ; আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই না। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সেকথা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মুহূর্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে-কথা বিদ্যুতের মতো আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ, আমার কিরণ।
ইতিপূর্বে আমি কোনো অনাত্মীয়া মহিলার সংস্রবে আসি নাই, যে নব্য-রমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি ; অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্‌খানে শিষ্টতার সীমা, কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার, তাহা আমি কিছুই জানি না ; কিন্তু

ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্যূন।
কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম, চা-টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত "মহীন্দ্রবাবু, কাল সকালে আসবেন তো ?" তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত--
কী মোহিনী জান, বন্ধু, কী মোহিনী জান !
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-হেন !
আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, "কাল আটটার মধ্যে আসব।" তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না--
পরাণপুতলি তুমি হিয়ে-মণিহার,
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কল্পনা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শুভ-অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শুনাইব, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকল্পে আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন কি স্থির করিলাম, জর্মানপণ্ডিত-রচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে সর্বতোভাবে বুঝিতে পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, "কিরণ, তোমার আমতলা বেগুনের খেত আমার কাছে নূতন রাজ্য। আমি কস্মিনকালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মুহূর্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ।"
সূর্যাস্তকালে দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। যে যেন তাহার গৃহের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল ; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্রকেশের উপর পবিত্রতার উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্‌বেল হৃদয়সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোর্তিময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল।
এদিকে আমার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সস্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, এদিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে কোন্‌দিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস করিয়া তাহার বিপুল চরণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে এ-উদ্‌বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাবুর গৃহে গিয়া দেখি, তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দায় নির্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নূতন কাব্যসংগ্রহ, যে-পাতাটি খোলা

আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্‌ধৃত এবং তাহার পার্শ্বে লাল কালিতে একটি পরিস্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল ; বোধ হইল যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ এক ঘন্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে, আপন হৃদয়তরণীর পালে একটিমাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া, তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল জানি না ; মহীন্দ্রনাথ নামক কোনো বাঙালি যুবকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর কাহারো অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়-পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্তচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডির মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পুলকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরে কহিলাম, "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানা একবার দেখিতে পারি।" কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক্‌।"

আমি কিয়দ্‌দূরে একটা ধাপ নিচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশব্দগুলি জননীর ঘুমপাড়ানির গানের মতো অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল ; কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে আপনাদের সে-তর্কটা শেষ করিবেন না ?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শুভ অবসর দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগুলি কবিতা আছে, আপনাকে শুনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শুনিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।" ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্‌ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধহয় তাহার নির্জন শয়নকক্ষে নির্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লালপেন্সিলের দাগ দেওয়া একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল ; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই। পরীক্ষার অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজাগ্নির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে-যে কলেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, একথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনো আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্মানপণ্ডিত-রচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তর্কগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, "আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গুটিকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই তাহা হইলে ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিস্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।"

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। যদি এই কিরণ হয় ! অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম, "হয় হউক --

আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।" বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া বৃদ্ধের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্যজার্মান-পণ্ডিত-রচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে ; খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথবাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জিন পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতিবিচ্ছুরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো সুসংবাদের নির্ঝরধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম, "ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি।" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষার প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

ভবনাথবাবুর মুখ সস্নেহকরুণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না ; কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আমার গর্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এমনসময় আমাদের কলেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছল্‌ছল্‌ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।